Vol. 58 | No. 3 | 2023

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার দ্বিতীয় পর্যায়: পঞ্চাশ ও ষাটের দশক

Volume	58
Issue	3
Year	2023
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Masuda Khatun Jui
Published online	June 1, 2023
DOI	10.62328/sp.v58i3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v58i3.7
Pages	৯৫-১১৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার দ্বিতীয় পর্যায়: পঞ্চাশ ও ষাটের দশক

Check for updates

মাসুদা খাতুন জুঁই

সাহিত্য পত্রিকা

Shahitto Potrika
eISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 58
Number 3

সাহিত্য পত্রিকা (২০২৩) ৫৮ (৩): ৯৫-১১৫
DOI 10.62328/sp.v58i3.7

সাহিত্য পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার দ্বিতীয় পর্যায়: পঞ্চাশ ও ষাটের দশক

মাসুদা খাতুন জুঁই*

সারসংক্ষেপ: জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ, এস. এম. সুলতান প্রমুখের চিত্রচর্চার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের চিত্রকলার প্রথম পর্যায় নির্মিত হয়। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রাহমান, মুর্তজা বশীর, রশিদ চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, কাজী আবদুল বাসেত ও দেবদাস চক্রবর্তী (এবং এঁদের সাথে কলকাতা থেকে আসা মোহাম্মদ কিবরিয়া) প্রমুখ শিল্পী যে চিত্রভাষা নির্মাণ করেন, তাকে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রের দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ শিল্পীরা পাশ্চাত্য আধুনিক চিত্রধারার বিমূর্তকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হন এবং বিমূর্ত ছবি নির্মাণ করেন। আমিনুলদের প্রথম দিকের বিমূর্তকরণের মাঝে অবয়বের উপস্থিতি ছিল। বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ বা অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজমের প্রভাবে শিল্পীরা মূলত অবয়বহীন বিমূর্ত ছবি নির্মাণ শুরু করেন। বিমূর্ত চিত্রভাষা হলেও নিজের দেশ ও সমাজের অভিজ্ঞতাই তাঁদের ছবিতে প্রকাশ পেয়েছে। এভাবে ’৫০-এর দশকের মধ্য থেকে ’৬০-এর দশক পর্যন্ত তাঁরা যে বিমূর্তরীতির নিরীক্ষাধর্মী ছবিগুলো করেন, তা আমাদের আধুনিক চিত্রচর্চার দ্বিতীয় পর্যায় তৈরি করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই বৈশিষ্ট্যগুলোই বিশ্লেষিত হবে এ প্রবন্ধে।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা চর্চা শুরু হয়। চিত্রকলা যেহেতু সমাজবিচ্ছিন্ন কোনো কর্মকাণ্ড নয়, সে কারণে সমাজের আধুনিকতার সাথে শিল্পের আধুনিকতা যুক্ত। ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্পচর্চার শুরু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পর্যায়ে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পর্যায়েই পশ্চিমাকরণের মধ্য দিয়ে আধুনিকতার সূচনা ঘটে। পাশাপাশি এ অঞ্চলের আধুনিকতায় উপনিবেশবিরোধী ভাবনাও ক্রিয়াশীল ছিল। সেদিক থেকে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও আত্মপরিচয় নির্মাণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের আধুনিকতার যাত্রা শুরু বলা যায়। ঔপনিবেশিক পর্যায়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি ইত্যাদির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে আধুনিকতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম হয়। সমাজের এ পরিবর্তন ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর বাংলাদেশ অঞ্চলে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) চলমান থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে ধর্মনির্বিশেষে বাঙালি আত্মপরিচয় নির্মাণ প্রক্রিয়ার প্রভাব পড়ে শিল্পচর্চায়। জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ, এস. এম. সুলতানের শিল্পশিক্ষা ঘটে অবিভক্ত ভারতবর্ষের কলকাতায়। দেশবিভাগের পর তাঁরা বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) চলে আসেন এবং এখানে চিত্রচর্চা অব্যাহত রাখেন। এখানে জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তৎকালীন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক

---

* সহযোগী অধ্যাপক, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পরিবেশ তাঁদের শিল্পচেতনায় প্রভাব ফেলে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রভাবে তাঁরা আত্মপরিচয় নির্মাণ করতে গিয়ে বাংলার গ্রামীণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে চিত্রে নিরীক্ষার মাধ্যমে তুলে আনেন। পাশ্চাত্য বিভিন্ন রীতি যেমন কিউবিজম, এক্সপ্রেশনিজম, ফবিজম প্রভৃতি রীতিকৌশলের সাথে তাঁদের চিত্রে বাংলার ঐতিহ্যবাহী বিষয়বস্তুর এবং অনেকের ক্ষেত্রে লোকশিল্পরীতির সংশ্লেষ ঘটে। এভাবে তাঁদের চিত্রচর্চার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের চিত্রকলার প্রথম পর্যায় নির্মিত হয়। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রাহমান, মুর্তজা বশীর, রশিদ চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, কাজী আবদুল বাসেত ও দেবদাস চক্রবর্তী (এবং এঁদের সাথে কলকাতা থেকে আসা মোহাম্মদ কিবরিয়া) প্রমুখ শিল্পী যে চিত্রভাষা নির্মাণ করেন, তাকে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রের দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে পাস করার পর এই শিল্পীরা সৃজনশীলতা এবং নিরীক্ষাধর্মিতার মধ্য দিয়ে যে বিমূর্ত চিত্রভাষা নির্মাণ করেন তাকেই দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তরণ হিসেবে ধরা হয়েছে। এখানে বিমূর্ত রীতির চিত্র বা abstract art বলতে যা বোঝানো হয়েছে, তা হলো:

> Term that can in its broadest sense be applied to any art that does not represent recognizable objects (much decorative art, for example), but which is most commonly applied to those forms of 20th-cent. art in which the traditional. European conception of art as the imitation of nature is abandoned. Although modern abstract art has developed into many different movements and 'isms', three basic tendencies are recognizable within it; (i) the reduction of natural appearances to radically simplified forms... (ii) the construction of art objects. form non-representational basic forms... (iii) spontaneous 'free' expression... (Chilvers et al, 1988: 2).

এই সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী বিমূর্ত শিল্প পুরোপুরি অপ্রতিনিধিত্বশীল হতে পারে আবার কিছুটা প্রতিনিধিত্বশীল হতে পারে।

প্রথম পর্যায়ের জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ, এস. এম. সুলতান এ চারজন শিল্পীর চিত্রভাষায় ব্যবহৃত বাঙালি সাংস্কৃতিক উপাদান (অর্থাৎ আবহমান বাংলার গ্রামীণ প্রকৃতি ও মানুষ প্রভৃতি) আত্মপরিচয় নির্মাণের উপাদান হয়ে উঠেছিল, পার্থ মিত্র যাকে বলেছেন ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে শৈল্পিক প্রকাশের প্রতিরোধ (Partha, 2007: 10)। অর্থাৎ চিত্রের মাধ্যমে শিল্পীরা আত্মপরিচয় নির্মাণ করে ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। বাংলার প্রকৃতি, সাধারণ মানুষ ও লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয় ও উপাদান চিত্রে অঙ্গীভূত হয়ে আত্মপরিচয়ের ভাষা নির্মিত হয়েছে এই শিল্পীদের কাজে। এভাবে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক ভাবধারার বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় এই আত্মপরিচয়ের ভাষা তৈরি করে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এ চারজন শিল্পীর গ্রামীণ প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষকে নিয়ে ছবি আঁকার ধরন ছবির একটি স্থায়ী বিষয়ে পরিণত হয়, যা আমিনুল, হামিদুর, মুর্তজা, রাজ্জাক, রশিদ, দেবদাস, জাহাঙ্গীর, বাসেত প্রমুখের ছাত্রজীবন এবং তৎপরবর্তী

সময়ে প্রভাব ফেলে। এ শিল্পীদের অনেকেই আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে পাস করে বিদেশে যান শিল্পচর্চায় উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিতে। তাঁদের অর্জিত অভিজ্ঞতা আমাদের চিত্রচর্চায় নতুন উপাদানের সংযোজন ঘটায়। ’৬০-এর দশক পর্যন্ত তাদের বিমূর্ত চিত্রভাষার চর্চাকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। এই চিত্রভাষা চর্চার সাথে ’৪০-এর দশকের শিল্পীদের চিত্রভাষার সম্পর্কের বিষয়টিও ব্যাখ্যা করা হয়েছে এখানে। এর সঙ্গে আর্ট ইনস্টিটিউটে পাঠ গ্রহণের সময় আমিনুলদের ওপর জয়নুল আবেদিনের শিল্পদর্শনের প্রভাব নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, এই প্রভাব পরবর্তীসময়ে তাঁদের কাজে বিদ্যমান ছিল।

১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখে জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ‘গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস’-এ ক্লাস শুরু হয় (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫ : ৬৪)। দুই বছরের প্রাথমিক পর্ব (elementary part) ও তিন বছরের বিশেষায়িত কোর্স (specialized course) নিয়ে শিক্ষাপদ্ধতির কাঠামো গঠন করা হয়। বিশেষায়িত কোর্স পর্বে দুটি বিভাগ ছিল — ফাইন আর্ট বিভাগ ও কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগ। কলকাতা আর্ট স্কুলের পাঠ্যসূচি (curriculumn) অনুসরণ করা হয় ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে (Lala Rukh, 1998: 8-9)। তবে কলকাতা আর্ট স্কুলের পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হলেও শুরু থেকে ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের চিত্র অনুশীলনে জয়নুলের শিল্পদর্শনের প্রভাব পড়ে। ছাত্রদের ছবি আঁকার দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি তিনি বাংলার প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের জীবনকে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনের ওপর গুরুত্ব দেন। এ জন্য তিনি শ্রেণিকক্ষের বাইরে গিয়ে কর্মজীবী মানুষ, জীবজন্তু, নদী, নৌকা, হাটবাজার, ফসলের মাঠ, গাছপালা, গ্রাম ও শহরের দৃশ্য প্রভৃতি অনুশীলনের ওপর জোর দেন (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫ : ৬৫-৬৬)। ছাত্রদের চিত্র অনুশীলনের ক্ষেত্রে জয়নুলের এই সাধারণ মানুষের জীবন ও দেশের প্রকৃতিকে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লালা রুখ সেলিম লিখেছেন মজার বিষয় হলো কলকাতা আর্ট স্কুলে কর্মরত মানুষের অবয়ব অনুশীলনের রীতি প্রচলিত ছিল, কিন্তু জয়নুলের দুর্ভিক্ষের চিত্রের বাস্তবতা এবং তাঁর ভাবনা ও বিশ্বাসের প্রভাবের দ্বারা সেই রীতি এখানে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছিল। জয়নুল বিশ্বাস করতেন এ দেশের শিল্পের সাথে অবশ্যই এই দেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্প এবং এ দেশের মানুষের জীবনপ্রণালির সম্পর্ক থাকতে হবে। লালা রুখ আরো লেখেন যে, এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে সেই সময়ের বাবু সংস্কৃতির মাঝে থেকেও জয়নুল কখনোই ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলায় পরিবর্তন আনেননি এবং তিনি অবিচলিতভাবে বিশ্বাস করতেন যে শিল্প যে সাংস্কৃতিক ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে, সে সম্পর্কে অবগত হওয়া খুবই জরুরি (Lala Rukh, 1998: 8)। লালা রুখের এই বক্তব্য থেকে জয়নুলের বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। জয়নুল যে ছাত্রদের সাধারণ মানুষের জীবনকে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ছবি আঁকতে বলেছিলেন, তার উদাহরণ পাওয়া যায় ছাত্রদের বিষয় নির্বাচনে। ছাত্ররা অতিসাধারণ মানুষের জীবন ও প্রকৃতিকে বিষয় করে ছবি এঁকেছে। যেমন — একটি ছবির কথাই ধরা যাক, তা হলো, আমিনুল ইসলামের ‘রাতে গানের আসর’ (জলরং, ১৯৫১: ১৯)। ছবিটিতে অতিসাধারণ মানুষের জীবনে বিনোদনের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

আমিনুল ইসলাম তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণায় জয়নুলের এই সাধারণ মানুষের জীবনকে পর্যবেক্ষণের বিষয়ে লিখেছেন:

> এ-সময় আবেদিন সাহেব একটা কম্পোজিশন ক্লাস নিয়েছিলেন, যার সাবজেক্ট ছিল স্বর্ণকার, ধুনকার, নৌকায় গুণ টানা, কামার অথবা কুমারের কর্মরত অবস্থার দৃশ্য।... ঐ সমস্ত বিষয়ের মধ্যে আমি বেছে নিয়েছিলাম তখনকার ইংলিশ রোডে অবস্থিত কামারশালায় তৈরি ছুরি, দা ইত্যাদির শান দেওয়ার দৃশ্য। অন্য ছাত্রদের মধ্যে আবদুর রহমানের 'গুণ টানা' আর সম্ভবত লোকনাথের 'স্বর্ণশিল্পী'র কাজটা বেশ ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিল। লোকনাথের বাবাও ছিলেন একজন স্বর্ণশিল্পী। শিল্পী হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে এই সব দরিদ্র শ্রমজীবী — জীবনের ছবি আঁকার প্রবর্তনা, ঢাকা আর্টস্কুলের পরবর্তী প্রায় সমস্ত ছাত্রেরই সামাজিক ভাবনায় প্রভাব ফেলেছে বহুদিন। (আমিনুল, ২০০৩: ৩৫)

আমিনুল ইসলাম এই বহির্জগৎ চেনার ব্যাপারে আরো লেখেন 'ক্লাসের শেষে আমরা প্রায় প্রত্যেক দিনই সদরঘাট অঞ্চলে যেতাম বিভিন্ন ধরনের নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ এবং অসংখ্য মানুষজনের বসার ভঙ্গি, হাঁটার ভঙ্গি গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখার চোখ তৈরি করতে। এই পর্যবেক্ষণ থেকেই জনমানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য অবলোকনের এক চোখ তৈরি হতে থাকে' (আমিনুল, ২০০৩: ৩৪)। মাহমুদ আল জামান লিখেছেন:

> ওঁরা তিনজন (আবদুল বাসেত, দেবদাস চক্রবর্তী, আবদুর রউফ) স্কেচ করবার জন্য কাকডাকা ভোরে চলে যেতেন কেরানীগঞ্জ, জিঞ্জিরা বা সদরঘাটে।... এই তিনজন আউটডোরে স্কেচ করার মধ্য দিয়ে পরিণত হয়ে উঠেছিলেন। আউটডোরে প্রবহমান জীবন অবলোকন তাঁদের শিল্পিত সত্তায়ও এক অর্থযোজনা করেছিল জীবন ও মানুষকে দেখবার চোখও তৈরি হয়েছিল। (মাহমুদ, ২০০৪: ২৭)

এই বক্তব্যগুলো একটু বিস্তৃত পরিসরে উল্লেখ করা হলো এ কারণে যে, এর মধ্য দিয়ে আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের ছবি আঁকার প্রেরণার উৎসের পরিচয় মেলে। ছাত্রদের মাঝে সাধারণ মানুষের জীবনকে বোঝার আগ্রহের কারণে পরবর্তী সময়েও তাদের চিত্রে মানুষের উপস্থাপনার প্রাধান্য ছিল। ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরে নিরীক্ষাধর্মিতার মধ্য দিয়ে তাঁরা যে বিমূর্ত রীতির কাজগুলো করেছেন, সেগুলোর অধিকাংশই মানুষের অবয়বনির্ভর।

এই শিল্পীদের দ্বারা '৫০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে '৬০-এর দশকের মধ্যে চিত্রে যে বড় পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তা হলো বিমূর্ত রীতির চর্চা, বিশেষ করে পুরোপুরি অপ্রতিনিধিত্বশীল বিমূর্ত রীতির উদ্বোধন এবং তেলরং, অ্যাক্রেলিক প্রভৃতি উপকরণ ও নানা করণকৌশলের (যেমন impasto কৌশলে রঙের প্রয়োগ, palette knife-এর মতো সরঞ্জামের ব্যবহার এবং রঙের মাধ্যমে ক্যানভাসে texture বা বুনটের সৃষ্টি ইত্যাদি) ব্যাপক ব্যবহার। মূলত এর আগে তেলরং এবং অ্যাক্রেলিকের ব্যবহার সীমিত ছিল আমাদের আধুনিক চিত্রচর্চায়। বিমূর্ত রীতির চর্চা এবং তেলরং বা অ্যাক্রেলিক প্রভৃতি নানা মাধ্যমের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সামগ্রিকভাবে এই পরিবর্তনগুলো সংঘটিত হলেও

প্রত্যেক শিল্পীরই নিজের সৃষ্টির ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা রয়েছে।

এই শিল্পীদের চিত্রকর্মগুলো আমাদের আধুনিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে ৫০ ও ৬০-এর দশকের নতুন চিত্রভাষা নির্মাণ করে এবং একে বলা যেতে পারে আমাদের আধুনিক চিত্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের উত্তরণ। তবে এ চিত্রভাষার তাৎপর্য, স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার অবকাশ থেকে যায়। এবং এর সঙ্গে চল্লিশের শিল্পীদের বা জয়নুল, কামরুল, সফিউদ্দীন - এঁদের যোগাযোগ বা সম্পর্কটা কোথায়, সে ব্যাখ্যারও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ, '৪০- এর উত্তরাধিকার ও '৫০-এর দশকের নতুন শিল্পচেতনা নিয়েই '৫০-এর শিল্পীরা অগ্রসর হয়েছিলেন। ঢাকায় শিল্পশিক্ষা শেষ করে এঁদের অনেকেই বিদেশে উচ্চতর শিক্ষার জন্য যান বা না যান '৫০-এর দশকের মধ্যপর্ব থেকে এঁদের দ্বারাই বিমূর্ত রীতির চর্চার মাধ্যমে নতুন ধরনের ছবি নির্মিত হয়।

তবে বিমূর্ত রীতির চর্চা এর আগেও হয়েছে জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান ও সফিউদ্দীন আহমেদের কাজের মধ্য দিয়ে। জয়নুলদের বিমূর্ত রীতির ধরন ছিল আলাদা। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে জয়নুল আবেদিনের **১৯৫৩** সালে করা 'বাঙালি রমণী' ছবিটির কথা ধরা যাক। ছবিটিতে অবয়বের সরলীকৃত রূপ, অবয়ব ও পটভূমির জ্যামিতিক বিভাজন, সমতলভাবে রঙের প্রয়োগ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ছবির বিষয়বস্তুকে বাস্তব থেকে অনেকটাই দূরে নিয়ে যায়। অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক ভ্রমের মাধ্যমে বাস্তব এখানে রূপ পায়নি। অথচ বিষয়ের চিত্রণে বাস্তবের অনুভব আছে। এখানে সরলীকৃত রূপ, সমতলভাব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের কারণে চিত্র কিছুটা প্রতিনিধিত্বশীল বিমূর্ত রূপ লাভ করেছে। কামরুল হাসানের 'মাছ ধরা' ছবিটিতে অবয়ব সরল করে আঁকা, সমতলভাবে রঙের ব্যবহার এবং পুরো দেশ বা স্পেসে ছোট ছোট উলম্ব রেখা এঁকে ফসলের জমির ইঙ্গিত করা হয়েছে। ছবিটি বাস্তবের ইঙ্গিত দেয় কিন্তু বাস্তবের অনুপুঙ্খ বর্ণনা কোথাও নেই। এভাবে এ ছবি বিমূর্ত গুণ লাভ করেছে। বিমূর্ত রীতির আরেকটি উদাহরণ কামরুল হাসানের 'The bride' (ষাটের দশক) ছবিটি। এখানেও রূপের সংক্ষিপ্ততা ছবিতে বিমূর্ত গুণ আরোপ করেছে। সফিউদ্দীন আহমেদ ছাপচিত্রের মাধ্যমে বাংলার গ্রামীণ প্রকৃতির নানা বৈশিষ্ট্য যেমন নদীর বাঁক, গাছপালা, জালের বাঁকানো রেখা, মাছের বাঁকানো রেখা, নৌকার বাঁকানো রেখা ইত্যাদিকে আশ্রয় করে বিমূর্ত ছবি নির্মাণ করেছেন। তাঁর 'বন্যাকবলিত গ্রাম' (এচিং, **১৯৫৮**) এবং 'নেমে যাওয়া বান' (সফট-গ্রাউন্ড অ্যাকুয়াটিন্ট, **১৯৫৯**), ছাপাই ছবি দুটি বিমূর্ত রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মোটকথা এ তিন শিল্পীর বিমূর্তের ভিত্তি ছিল অবয়বের সরলীকরণ, সমতলভাব এবং কামরুল হাসান ও জয়নুল আবেদিনের ক্ষেত্রে লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিরীক্ষা। ব্রিটিশ ছাপচিত্রশিল্পী স্ট্যানফল উইলিয়াম হেইটারের সুরিয়ালিজমের প্রভাবে অবচেতন মনের ক্রিয়া (automatism)-ভিত্তিক নমনীয় রেখার মতো (Raimond, 2004 101) সফিউদ্দীনও স্বয়ংক্রিয় রেখা দ্বারা জমিনকে নানাভাগে ভাগ করেছেন, নানা বক্র আকৃতির রেখা বাংলার প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন। এভাবে সফিউদ্দীনের ছবিতে সমতলভাবের প্রাধান্য এসেছে। জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসানের ছবিতে সমতল ভাবের প্রাধান্য এসেছে লোকশিল্পের গুণাগুণ থেকে। নব্যবঙ্গীয় চিত্রের বৈশিষ্ট্যে চীনা-জাপানি শৈলীর প্রভাবের প্রতি জয়নুলের আগ্রহের কথা বিশ্লেষণ

করেছেন নিসার হোসেন তাঁর লেখাতে (নিসার, ২০০৭: ২৭৫)। অন্যদিকে আমিনুলরা অবয়বনির্ভর বিমূর্ত রীতির ছবির চর্চায় পোস্ট-ইম্প্রেশনিজম, এক্সপ্রেশনিজম, কিউবিজম, ফবিজম প্রভৃতি পাশ্চাত্যের কয়েকটি শিল্পধারার বৈশিষ্ট্যকে আত্মস্থ করে নিজ দেশের বিষয়াবলিকে নিরীক্ষাধর্মিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এই নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যে অন্বেষা তাঁদের ছিল, তা হলো 'Integrity of the picture plane' বা চিত্রের দেশ (স্পেস)-এর বিশুদ্ধতা বা অখণ্ডতা (Golding, 1997: 54)। উনিশ শতক জুড়ে শিল্পীরা চিত্রের দেশের বিশুদ্ধতাকে গ্রাহ্যকরণের বিষয়ে ক্রমবর্ধমানভাবে উদ্বিগ্ন ছিল। কিউবিজমের উদ্দেশ্য এবং জটিলতা এটা প্রমাণ করে। কিউবিস্ট শিল্পীদের প্রধান চিন্তা ছিল বিষয়কে এর পারিপার্শ্বিকের সাথে এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ করা যেখানে চিত্রসংক্রান্ত জটিলতা প্রতিনিয়ত ক্যানভাসের সমতল বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয় এবং শিল্পী মূলত বিষয়ের চিত্রণ করতে গিয়ে এরই মুখোমুখি হচ্ছিল (Golding, 1997: 54)। এটা করতে গিয়ে শিল্পীরা কিছু কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, যেমন — গতানুগতিক পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহারকে অস্বীকার করা, পরিপ্রেক্ষিতের অসঙ্গতি তৈরি করা, বিষয়ের চারদিকের খালি দেশকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং সামনের দিকে অগ্রসরমাণ করে গুরুত্ব দেওয়া, আকারের বহিরেখার ছেদ বা বিভক্তি, আকারের সরলীকরণ ইত্যাদি (Golding, 1997: 56-57)। এভাবে ক্যানভাসের সমতল বৈশিষ্ট্যকে বিশুদ্ধ রেখে শিল্পী তার বিষয় বিশেষত অবয়বনির্ভর বিষয়কে বর্ণনা করেছেন, যা একধরনের জটিলতার সৃষ্টি করেছে। আমিনুলরা মূলত এভাবে চিত্রের স্পেসের সমতল বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়ে বিষয় বর্ণনায় আগ্রহী ছিলেন। তাদের কারও কারও চিত্রে (যেমন কাইয়ুম চৌধুরী) লোকশিল্পের মোটিফ বা রং প্রাধান্য লাভ করলেও লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়ে তারা বিষয় আর ক্যানভাসের সমতল ভাবের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেননি। জয়নুলরা চিত্রের স্পেসের বিশুদ্ধতাকে রক্ষার চেষ্টা করেননি। তাঁরা মূলত অবয়বের সরলীকরণের মাধ্যমে বিমূর্তগুণ এনেছেন। বিষয়ের চারপাশের খালি দেশকে গুরুত্ব দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসরমাণ করেননি কিংবা সুনির্দিষ্টভাবে পরিপ্রেক্ষিতের অসঙ্গতি তৈরি করেননি। যদিও তাদের ক্ষেত্রেও এক্সপ্রেশনিজম, ফবিজম এবং কিউবিজমের প্রভাব ছিল অবয়বের সরলীকরণ কিংবা রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে। কিউবিজম যেন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য-উভয় অঞ্চলে আধুনিকতার সমার্থক হয়ে উঠেছিল, পার্থ মিত্র যেমন বলেছিলেন :

> The enormous expansion of the European cultural horizon in the 'heroic' age of the avant-garde cannot be gainsaid, as the modernist technology of art, not to mention the formal language and syntax of Cubism, allowed artists around the globe to device new ways to represent the visible world. The modernist revolt against academic naturalism and its attendant ideology was openly welcomed by the subject nations who were engaged in formulating their own resistance to the colonial order (Partha, 2014: 37).

এভাবে এ অঞ্চলের শিল্পীদের কাছেও কিউবিজম একটি অত্যাবশ্যক কৌশল হয়ে উঠেছে আধুনিক নিরীক্ষামূলক ছবি তৈরির ক্ষেত্রে।

আমিনুলদের অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্বের কিছুটা প্রতিনিধিত্বশীল বিমূর্ত ছবিগুলো ব্যাখ্যার

দাবি রাখে। উদাহরণ হিসেবে আমিনুল ইসলামের 'রাখাল' (তেলরং, ১৯৫৪) ছবিটি বিশ্লেষণ করা যায়। চিত্রটিতে পরিচিত বিষয় যেভাবে সংস্থাপিত হয়েছে, তা হুবহু বাস্তবের মতো না কিন্তু বাস্তবের অনুভূতি জাগায়। চিত্রে মানুষ, গাছ, গরু — সবই স্পষ্ট করে আঁকা। তবে এই অবয়বগুলোসহ পুরো পৃষ্ঠতলকে শিল্পী নানা জ্যামিতিক আকৃতিতে ভাগ করেছেন মূলত রঙের প্রাধান্যে। এর ফলে অবয়বগুলো কিছুমাত্রায় নানা অংশে ভাগ হয়েছে ফলে বিষয়কে অনুভব করার আগেই জ্যামিতিক বিভাজনের জন্য চিত্রে সম্মুখ, মধ্য আর পশ্চাৎপটের গভীরতা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না। ফলে চিত্রের সম্মুখভাগ, মধ্যভাগ, পশ্চাদভাগ একটি দুই মাত্রার সমতল পটভূমিতে একে অন্যের মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে একটি তলের সৃষ্টি করে চিত্রে অগভীর ভাব বা shallowiness-এর অনুভূতি জাগায় অথচ একই সময়ে বাস্তবতারও বোধ তৈরি করে। এই বৈশিষ্ট্যটি চিত্রশিল্পচর্চার ইতিহাসে প্রথম পাওয়া যায় পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের কাজে, শিল্প ইতিহাসবেত্তা এইচএইচ আরনাসন (HH Arnason) যাকে বলেছেন চিত্রের নতুন বাস্তবতা, যা সেজাঁ (Cezanne) চেষ্টা করেছিলেন তাঁর চিত্রপটে মূর্ত করতে (Arnason, 1977: 55)। বিষয়টিকে একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। শিল্প ইতিহাসবেত্তা এইচএইচ অরনাসন লিখেছেন :

> …Post-Impressionism... does offer the virtue of specifying the one element that Seurat, Cezanne, Gauguin and Van Gogh all had in common-their determination. to move beyond the relatively passive registration of perceptual experience and give formal expression to the conceptual realm of ideas and intuitions. (Arnason, 1977: 52)

আরনাসন আরো লেখেন:

> Never would they work other than in direct contact with perceptual reality, if only through the medium of photography, but increasingly perception and its translation into art would cease to be an end unto itself and become a means toward the knowledge of form in the service of expressive content (Arnason, 1977: 52).

আরনাসনের বক্তব্যের এই ধারণামূলক (conceptual) ভাব এবং রূপ নতুন বাস্তবতার উন্মোচন ঘটায়। কীভাবে এই নতুন বাস্তবতার উন্মোচন ঘটে, তা সেজাঁর ছবির বিশ্লেষণে স্পষ্ট হবে।

'Bacchanal" (1875-76) চিত্রকর্মে সেজা অবজেক্ট বা মানুষের অবয়ব এবং তার চারপাশের জায়গা কীভাবে একে অন্যের মাঝে প্রবিষ্ট হচ্ছে বা একে অন্যকে কীভাবে ছেদ করছে, তা অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছেন। এই ছবিতে মানবশরীরের অংশ অনেক ক্ষেত্রে মেঘের মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে (Arnason, 1977: 56)। সেজার আর একটি ছবি 'The Bay from L' Estaque' (1886)-তে তিনি ছবির স্পেসকে রেনেসাঁ ও বারোক রীতির ছবির মতো পশ্চাদপসরণ করাননি পরিপ্রেক্ষিতের মাধ্যমে। ছবির সম্মুখভাগের ঘরবাড়ি এবং এর মাঝে মাঝে মেটে রং, হলুদ, লালচে কমলা ও সবুজে আঁকা গাছগুলোকে শিল্পী

এমনভাবে এঁকেছেন, যেন তা দৃষ্টিপথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বাড়ি, বাড়ির চিমনি, ছাদ, গাছপালা — এসবের মাঝে বায়ু চলাচলের মতো কোনো স্বাভাবিক স্পেস তৈরি করা হয়নি। সে কারণে এদের অবস্থানকে অস্বাভাবিক মনে হয়। এদের তুলনায় উপসাগরের নীল অনেক বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং নিজেকে দুর্বোধ্য ও সমপ্রকৃতির (homogeneous) করে তোলে (Arnason, 1977: 57)। এই ব্যাখ্যাগুলো থেকে বোঝা যায় কীভাবে ছবির পশ্চাৎপটের বিষয় আর সম্মুখভাগের বিষয় একে অন্যের মাঝে প্রবিষ্ট হতে পারে কিংবা ছবির মধ্যে দূরের বস্তু গভীরতার বোধ তৈরি না করে ছবিতে একটি অগভীর (shallow) ভাব আনে। এই বৈশিষ্ট্যের আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো পিকাসোর (Picasso) 'Les Demoiselles D' Avignon' (1907)। এই ছবির রীতিগত কাঠামো (formal structure) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরনাসন লিখেছেন, অগভীর, অভেদ্য দেশ, শারীরিক বিকৃতি (যেখানে সম্মুখ মুখমণ্ডলে নাকের পার্শ্বচিত্র অথবা মুখের পার্শ্বচিত্রে সম্মুখ আকৃতির চোখ স্থাপিত) এবং পুরো জমিন, অবয়ব এবং ভঙ্গুর পশ্চাৎপট সবকিছু একটি অসমতল, এলোমেলো, কাত হওয়া, অমসৃণ বৈশিষ্ট্য-সংবলিত পরস্পরছেদী জালের মতো বিন্যাস সৃষ্টি করেছে এই ছবিতে (Arnason, 1977: 146)। এখানে 'shallow space-এর সাথে আর একটি বিষয় উঠে এসেছে, তা হলো 'sealed space' বা অভেদ্য কিংবা অপ্রবেশ্য স্পেস। সেজাঁর কাজেও স্বাভাবিক পরিসরের (natural space) অন্তর্ধান অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলীয় বা arial perspective-এর অনুপস্থিতিতে অভেদ্য পরিসরের আবির্ভাব ঘটেছে। এখানে আর একটি বিষয়ের অবতারণা প্রাসঙ্গিক হবে, সেটি হলো, বিষয়কে গভীরতা প্রদান না করে সমতলে (plane) আঁকার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাস্কর্যের (tribal sculpture) প্রভাব ছিল পিকাসো, মাতিস বা গগাঁর ক্ষেত্রে। আরনাসন যেমন লিখেছেন, পিকাসো ট্রাইবাল ভাস্কর্যকে 'abstract plastic mass' হিসেবে দেখেছেন। এই উপলব্ধি তাঁকে স্পেস সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানে সহায়তা করেছে (Arnason, 1977: 147)।

আমাদের দেশে '৫০-এর দশকের শিল্পীরা যখন নিরীক্ষামূলক কাজ শুরু করেন, তখন তাঁদের প্রচেষ্টা ছিল ছবির বিষয় এবং একাধিক তলকে একীভূত (integrate) করা, প্রতিচ্ছেদ (intersection) করা এবং একটি অগভীর (shallow) সমতলভাব (flatness) তৈরি করা। এবং অনেক সময়েই পরিসর (space) হয় অপ্রবেশ্য, অভেদ্য যাকে আরনাসন বলেছেন 'sealed space' অর্থাৎ যা স্বাভাবিক পরিসর বা natural space নয়। বিষয়কে মূর্ত রেখেও চিত্রের পৃষ্ঠতল কতখানি অগভীর বা shallow হতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কাইয়ুম চৌধুরীর 'মসজিদে লাল মাছ' (১৯৬১, তেলরং), যেখানে পুরো বিষয়টি স্থাপত্যসংক্রান্ত স্থান (architectural space)-এ নিবদ্ধ। কিন্তু শিল্পী এই দালান, চত্বরের মাঝে সম্মুখভাগের ছোট জলাধারকে (একটি নির্দিষ্ট জায়গা দখল করা সত্ত্বেও) সমতলভাবে এঁকেছেন অথচ সবকিছু একই সঙ্গে বাস্তবতার অনুভূতি জাগায়। যে পরিসর বা স্পেস এই চিত্রে সৃষ্টি হয়েছে, তা অভেদ্য (sealed space), এখানে স্বাভাবিক পরিসর (natural space) নেই। সত্যিকার অর্থে এই বাস্তবতা চোখে দেখা বাস্তবতা নয়, ধারণামূলক বাস্তবতা। আর একটি ছবি এখানে আলোচনায় আসতে পারে, সেটি হলো দেবদাস চক্রবর্তীর 'জড়জীবন' (তেলরং, ১৯৫৭)। সদ্য পাস করা (১৯৫৬) দেবদাসের এ কাজটি অনুশীলনধর্মী হলেও এখানে স্পেসকে অগভীর করা হয়েছে দূরের বস্তুকে প্রাধান্য

দিয়ে। অনুশীলনধর্মী কাজ এবং বাস্তব বিষয় হলেও পরিপ্রেক্ষিতকে অস্বীকার করা হয়েছে ছবিতে। এভাবে চিত্রে পরিসর (space) আর তাতে বিষয়ের সংস্থান নিয়ে নতুন নির্মাণ শিক্ষানবিশি পর্যায়ে যে তাঁকে ভাবিত করেছিল, ছবিটি তার প্রমাণ।

বিভিন্নজনের লেখা থেকে এ শিল্পীদের পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট রীতির প্রভাবের কথা জানা যায়। মাহমুদ আল জামান লিখেছেন:

> বাসেত, দেবদাস চক্রবর্তী ও রউফ শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে, স্কেচ করে এই ক্যাপিটেল রেস্টুরেন্টে এসেই আড্ডা ও দুপুরের আহার সেরে নিতেন। তখন ভ্যান গঘ, গগাঁ সেজান—এঁদের হৃদয়মন অধিকার করেছিল। এঁদের জীবনযাপন ও সৃষ্টির প্রভাময় উদ্যান দ্বারা এঁরা আবিষ্ট ছিলেন। (মাহমুদ, ২০০৪: ২৭)

সৈয়দ আজিজুল হক লিখেছেন:

> ভ্যান গঘ অথবা গগাঁ কিংবা তুলো লোত্রেক ছিল তখন সকলেরই আদর্শ। রোমান্টিসিজমের চূড়ান্ত অনুভব ছিল তাঁদের জীবনেও। ভ্যান গঘের জীবন-অবলম্বী চলচ্চিত্র *লাস্ট ফর লাইফ,* গগাঁর *নোয়া নোয়া জার্নাল,* লোত্রেকের *মুল্যাঁ রুজ* নিয়ে উন্মাদনা ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে। মুর্তজা বশীর কি অঙ্কনে, কি জীবনযাত্রায় এসবের প্রতিফলন ঘটাতে চাইতেন। তাতে অঘটনও কিছু কিছু ঘটত। কিন্তু তাতে তাঁদের কারোরই কোনো অনুশোচনা ছিল না। আঁকার প্রতি বিশ্বস্ততা তাঁদের সকলকে এ সবকিছুর ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছিল। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫ক: ৪১)

চিত্রের সম্মুখতল আর পশ্চাদতলের প্রতিচ্ছেদ, অগভীর পৃষ্ঠতল তৈরি, সরলীকরণ-নিরীক্ষার মাধ্যমে ইত্যাদি কৌশলের চর্চার প্রমাণ মেলে শিল্পীদের নিজেদের উক্তি থেকে। যেমন মুর্তজা বশীর লিখেছেন:

> ...সবচেয়ে বেশি আমাকে অভিভূত করে পরিতোষ সেনের কাজগুলো। আমার মনে হলো, যা আমি বলতে চাচ্ছি তা একমাত্র পরিতোষ সেনের কাছ থেকেই আমার পক্ষে নেয়া সম্ভব। পরিতোষ সেনের কাজগুলোয় ছিল রঙের খুব সীমিত ব্যবহার, ফর্মের সরলীকরণ এবং একটা ফ্ল্যাট সারফেস। সমতলভূমিতে অনেকটা দ্বিমাত্রিকভাবে চিত্রগুলো চিত্রিত করা হয়েছে। চিত্রগুলো ছিল প্যালেট নাইফে আঁকা। প্যালেট নাইফ দিয়ে রেখা, ফর্ম তৈরি এবং রংকে ব্যবহার করা হয়েছিল।
>
> আমি সেই টেকনিকে এতটাই অভিভূত হয়ে যাই যে সেভাবেই কাজ শুরু করি। ফলে, আমি কিছুটা পরিতোষ সেন দ্বারা অনুপ্রাণিত হই এবং কিছুটা অনুকরণও করি। সেই সময় আমি প্যালেট নাইফ দিয়ে বেশ কিছু ছবি আঁকি। (মুর্তজা, ২০১৪: ৬০)

উল্লেখ্য, ভারতের শিল্পী পরিতোষ সেন (১৯১৮-২০০৮) এবং ক্যালকাটা গ্রুপের (১৯৪৩) শিল্পীদের উদ্দিষ্ট ছিল ইম্প্রেশনিজম, পোস্ট-ইম্প্রেশনিজম, ফবিজম এবং কিউবিজমের রীতিকে নিয়ে নিরীক্ষা করা এবং চর্চার মধ্যে নিয়ে আসা (পরিতোষ, ২০০২: ১৩)। পরিতোষ সেন ক্যালকাটা গ্রুপের সেই সময়ের ভাবনা সম্পর্কে লিখেছেন, ছবির

সমতল জমি, রেখার প্রাধান্য, স্পেসের বিভাজন ইত্যাদিকে তাঁরা নতুন মূল্যবোধের অঙ্গ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন (পরিতোষ, ২০০২: ১৩)। মুর্তজা বশীর ১৯৫৬ সালে ইতালি যাওয়ার পর ছবির কাঠামো এবং স্পেস নিয়ে তাঁর একটি নতুন উপলব্ধি সম্পর্কে লেখেন :

> একটা জিনিস তখন অনুভব করলাম, আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে যা বুঝি সেটি আমার কাছে নতুনভাবে দেখা দিল।... তথাকথিত ব্যাকগ্রাউন্ড বলে কোনো কিছু নেই। সবকিছুই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি চেয়ারের ওপর একটি লোক বসে রয়েছে। তার পেছনের জানালা যেমন সত্য তেমনি জানালার সামনে একজন বসে আছে এটাও সত্য। (মুর্তজা, ২০১৪ : ৬২)

১৯৫৪ সালে ফ্লোরেন্সে থাকার সময় আমিনুল ইসলাম তাঁর নতুন রীতিতে আঁকা ছবি সম্পর্কে লিখেছেন, 'এদের কোনোটাই একাডেমিক পদ্ধতিতে নয়। এগুলো আমার ছবি সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণার নতুন পর্যায়, আধা বিমূর্ত সরলীকরণ এবং জ্যামিতি ও ছন্দের রাখিবন্ধন' (আমিনুল, ২০০৩: ৭৯)।

এভাবে আমাদের দেশের '৫০-এর দশকের শিল্পীরা পাশ্চাত্যের পোস্ট-ইম্প্রেশনিজম, এক্সপ্রেশনিজম, কিউবিজম, ফবিজম প্রভৃতি রীতির বিমূর্তায়নের কৌশলকে আমাদের চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে নিজেদের সাংস্কৃতিক বিষয়াবলিকে উপস্থাপনার কৌশল হিসেবে প্রয়োগ করেছেন। এই অন্তর্ভুক্তিকরণ '৪০-এর দশকের শিল্পীদের অর্জনের পর আমাদের চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং আর একটি পর্যায়ে উন্নীত করে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে আমাদের চিত্রচর্চা বা ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে এই আত্তীকরণ সত্যই আমাদের সমৃদ্ধ করেছে, নাকি এটা পাশ্চাত্য অধিপত্যের লক্ষণ। এর উত্তরে পার্থ মিত্রের ভাষায় বলা যায়, প্রান্তিক অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও শিল্পীরা সক্রিয় প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিকে নিজেদের সংস্কৃতির সাথে যুক্ত করে তাকে শক্তিশালী করতে পারে (Partha, 2007: 9) । এ ক্ষেত্রে পার্থ মিত্র আরো যোগ করেন, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান নিজস্ব পরিচয়কে বাতিল করে দেয় না, বরং তাকে আরো সমৃদ্ধ করে (Partha, 2007: 9-10)। যেমন পাশ্চাত্যের এক্সপ্রেশনজিম ও কিউবিজম শিল্প আন্দোলন; যেখানে অপশ্চিমা (non-western) সাংস্কৃতিক উপাদান নতুন ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে (Partha, 2007: 12)। পার্থ মিত্রের এই বক্তব্য অনুযায়ী, পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট, কিউবিস্ট প্রভৃতি রীতি দ্বারা প্রভাবিত আমাদের শিল্পীদের কিছুটা প্রতিনিধিত্বশীল বিমূর্ত রীতির চর্চা একটি নতুন চিত্রভাষায় এ অঞ্চলের মানুষের অভিজ্ঞতা এবং বিষয়াবলিকে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের চিত্রচর্চার সমৃদ্ধিকেই প্রকাশ করে।

'৫০-এর দশকের দ্বিতীয় পর্ব জুড়ে সরলীকৃত রূপ, বিষয়, পটভূমির প্রতিচ্ছেদ, অগভীর এবং সমতল পৃষ্ঠতল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসংবলিত অবয়বনির্ভর বা কিছুটা প্রতিনিধিত্বশীল বিমূর্ত রীতির চিত্র নির্মাণ করেছেন আমিনুল, মুর্তজা, হামিদুর, কিবরিয়া, কাইয়ুম, রাজ্জাক, দেবদাস, বাসেত, জাহাঙ্গীর প্রমুখ। '৬০-এর দশকেও এই রীতি প্রবহমান থেকেছে। চিত্রচর্চায় পুরোপুরি অপ্রতিনিধিত্বশীল বিমূর্ত রীতির শুরু '৫০-এর

দশকের শেষ পর্যায়ে থেকে। মূলত আমিনুল ইসলামই এই প্রক্রিয়ায় অধিকসংখ্যক চিত্র রচনা করেছেন '৫০-এর শেষ থেকে পুরো '৬০এর দশকজুড়ে, মোহাম্মদ কিবরিয়া '৬০-এর দশকের শুরুতে বিমূর্ত রীতি শুরু করেন চিত্রকলা ও ছাপচিত্র উভয় মাধ্যমে। রাজ্জাক, বাসেত, হামিদুর রশিদ, জাহাঙ্গীর, দেবদাস, মুর্তজা — এঁরা সবাই বিমূর্ত চিত্রচর্চা '৬০-এর দশকেই শুরু করেন। তবে এ শিল্পীদের অধিকাংশই বিমূর্ত রীতি ব্যাপকভাবে চর্চা করেন '৭০ ও '৮০-এর দশকে, যে সময় এই প্রবন্ধের ব্যাপ্তির মধ্যে পড়ে না।

শিল্প ইতিহাসবেত্তা আবুল মনসুর '৫০-এর দশকের শিল্পীদের শিল্পকর্মের বিশ্লেষণে লিখেছেন:

> পঞ্চাশের শিল্পীরা তাঁদের গুরুদের অনুসরণ করেননি... পঞ্চাশের শিল্পীরাও নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রসারিত সুযোগে দলেবলে বিদেশে প্রশিক্ষণ নিয়ে এলেন, কেউ ফ্রান্সে কেউ ইতালিতে বা স্পেনে, কেউবা যুক্তরাষ্ট্রে। এঁরা এসে পূর্ব পাকিস্তানি শিল্পের একটা নতুন চেহারা উপস্থাপন করলেন, জাতি-ধর্মনির্বিশেষে বিমূর্ততাই যার মূল চরিত্র। এই পরিচয়মুক্ত পক্ষ-অবলম্বনহীন শিল্পে পাকিস্তানি শাসকদের খুব একটা অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, অতএব পঞ্চাশ-ষাটের দশকজুড়ে পাকিস্তানব্যাপী বিমূর্ত শিল্পের ব্যাপক বিস্তারের পেছনে এটি কোনো কার্যকারণ কি না সেটি একটি অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে। (আবুল মনসুর, ২০১৬: ১২৫)

বক্তব্যটিকে মেনে নিলে '৫০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে '৬০-এর দশক পর্যন্ত আঁকা আমিনুল, কিবরিয়া, মুর্তজা, হামিদুর, রাজ্জাক, রশিদ, কাইয়ুম, দেবদাস, বাসেত প্রমুখের অবয়বনির্ভর (অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের অবয়ব) বিমূর্ত রীতিতে আঁকা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক চিত্র মূল্যায়নের অবকাশ থাকে না। এই চিত্রগুলোর বিষয় বাংলার মানুষ, প্রকৃতি যা জয়নুল, কামরুল, সফিউদ্দীনের ধারাবাহিকতায় চলে এসেছে। কাজেই আমিনুলরা যে চল্লিশের শিল্পীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ছবি এঁকেছেন, তা-ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। চিত্রসমালোচক নজরুল ইসলামের মতে, 'বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের কোনো কোনো বিশ্লেষক মনে করেন, ইসলামি রাষ্ট্রতন্ত্র এবং সামরিক শাসনের কারণে এ দেশের শিল্পীরা ব্যাপকভাবে নির্বস্তুক আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছিলেন। ব্যাখ্যাটি আংশিক গ্রহণযোগ্য। কেননা আমরা দেখি জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ দিব্যি মানব-অবয়বভিত্তিক ছবি এঁকে গেছেন। (নজরুল, ২০১২: ১৯) পশ্চিম পাকিস্তানেও অবয়বনির্ভর ছবির চর্চা হয়েছে শুরু থেকে। আবদুর রহমান চুঘতাই (১৮৯৪-১৯৭৫) থেকে শুরু করে ফাইজ রাহামিন (১৮৮০-১৯৬৪), আল্লাহ বক্স (১৮৯৫-১৯৭৮), হাজি শরীফ (১৮৮৯-১৯৭৮), সৈয়দ হাসান আসকারী (১৯০৭-১৯৬৪), মোহাম্মদ হুসেইন হানজরা (১৯১১-১৯৮২), শাকির আলি (১৯১৬-১৯৭৫) আন্না মোলকা আহমেদ (১৯১৭-১৯৯৪), জুবেইদা আগা (১৯২২-১৯৯৭), অজ্জির জুবি (১৯২২), ইসমাইল গুগলী (১৯২৬), সাদেকিন (১৯৩০-১৯৮৭), জামিল নাক্স (১৯৩৯-২০১৯) প্রমুখ সকলেই অবয়ব নিয়ে চিত্র রচনা করেছেন। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিল আয়োজিত দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত মোহাম্মদ কিবরিয়ার 'তিন আত্মা' ও দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কাজী আবদুল বাসেতের 'মা ও শিশু' ছবি দুটি মানুষের

অবয়বনির্ভর বিমূর্ত রীতিতে করা। শুধু তা-ই নয়, আবদুল বাসেতের 'মা ও শিশু'র কম্পোজিশন জয়নুল আবেদিনের 'মা ও শিশু'র কথা মনে করিয়ে দেয়। এই প্রদর্শনীতে আমিনুল ইসলামের 'দুর্গত' ছবিটি প্রদর্শিত হয় এবং এই ছবিটি জয়নুলের 'চার মুখ'-এর বিন্যাসের সঙ্গে মিলে যায়। এস আমজাদ আলীর লেখা প্রকাশিত হয় ওই প্রদর্শনী নিয়ে ১৯৫৯ সালে 'পাকিস্তান কোয়ার্টার্লি'তে। সেখানে তিনি লেখেন যে ঢাকার এবং লাহোরের শিল্পীদের কাজকে স্পষ্টভাবে দুটি আলাদা শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দুই অঞ্চলের স্কুল ও শিক্ষকদের প্রভাব, বিশেষভাবে লাহোর ফাইন আর্ট বিভাগের মিসেস আহমেদ এবং ঢাকায় জয়নুল আবেদিনের প্রভাবের জন্য। তেলরঙে ইমপ্যাস্টো টেকনিক সাদাসিধা গ্রাম্য দৃশ্যের বাস্তবধর্মী চিত্র অনুশীলন ছিল লাহোরের বিশেষত নারী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই শিল্পীদের লাহোর ফাইন আর্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগ ছিল। কালো রঙের সরু লাইনের ব্যবহারে ইম্প্রেশনিস্টিক রীতিতে জলরঙে ভূমি এবং নদীর দৃশ্য অঙ্কন ছিল ঢাকার শিল্পীদের জন্য সাধারণ বিষয়। তিনি আরো লেখেন, লাহোরের নারী শিল্পীদের বিমূর্ত চিত্রের গুণাগুণ সেজার কথা মনে করিয়ে দেয়। একইভাবে ঢাকার শিল্পীদের সব কাজই ইম্প্রেশনিস্টিক রীতিতে ভূদৃশ্যের চিত্রায়ণ ছিল না। এমনকি ভূদৃশ্যের চিত্রায়ণে, কিছু শিল্পী (যেমন নিতুন কুণ্ড) বিমূর্ত আকার বা ছন্দোবদ্ধ নকশার অন্বেষণ করেছেন। অন্যদিকে কিবরিয়া, বাসেত, আমিনুল ইসলাম এবং অন্যরা স্পষ্টত বিমূর্ত রীতির ব্যবহার করেছেন। রশিদ চৌধুরী শাগালের সুরিয়ালিস্টিক রীতিতে প্রভাবিত হয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। মুর্তজা বশীর আকার, দেশ ইত্যাদির আধুনিকতাবোধকে প্রকাশ করতে গিয়ে 'ইতালীয় প্রিমিটিভ' রীতির (style of Italian primitive) ব্যবহার করেছেন (S Amjad, 1959: 29)।

এখানে আরেকটি বিষয়ের আলোচনা জরুরি, সেটি হলো কামরুল হাসান, জয়নুল আবেদিনের চিত্রে রেখার ব্যবহার নরম। তুলির রেখায় ছন্দায়িত, তরঙ্গায়িত ভাব আছে। এ ছাড়া ছবির একাধিক তলকে (পশ্চাৎপট, সম্মুখভাগ, মধ্যভাগ), একটি তলে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে খুব বেশি জটিলতার (complexity) সৃষ্টি হয়নি তাঁদের ক্ষেত্রে। অন্যদিকে আমিনুলদের পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট এবং কিউবিস্ট রীতির প্রভাবে জ্যামিতিকতার প্রাধান্য, চিত্রের স্পেস বা পরিসরের অখণ্ডতা রক্ষা এবং মাধ্যমগতভাবে তেলরং, অ্যাক্রেলিক, প্যালেট নাইফের ব্যবহার, ইমপ্যাস্টো কৌশলে রঙের প্রয়োগ ও রঙের মাধ্যমে বুনট তৈরি প্রভৃতি করণকৌশল ছবিতে দৃঢ়তার অনুভূতি বেশি প্রকাশ করতে সহায়তা করেছে। জলরঙে তুলির আঁচড়ে যা হয়ে ওঠে না। তবে কাইয়ুম চৌধুরী ও রশিদ চৌধুরী হয়তো এই দুইয়ের মাঝে একটি যোগসূত্র তৈরি করেছিলেন তাঁদের চিত্রে। তাঁরা লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্যকে (রং, অলংকার ইত্যাদি) নিপুণ দক্ষতায় পাশ্চাত্যঘেঁষা বিমূর্ত রীতিতে অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন।

এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান ও সফিউদ্দীন আহমেদের বাংলার সাধারণ মানুষ ও প্রকৃতি এবং জয়নুল ও কামরুলের ক্ষেত্রে লোকশিল্প আঙ্গিক ব্যবহার করার সাথে আত্মপরিচয় নির্মাণের যোগসূত্র ছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ সময়ে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে আত্মজাগরণের কালে,

সাধারণ মানুষ আর বাঙালি সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরার মধ্য দিয়ে জয়নুল, কামরুল আর সফিউদ্দীনের যে চেতনা জাগ্রত হয়, তার সঙ্গে তাদের শিল্পমানসও জড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীকালে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সময়ে তাঁদের এই চেতনা আরো দৃঢ় এবং পরিণত হয়ে বাঙালি হিসেবে আত্মপরিচয়ের পথ বেছে নেয় বাঙালি ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির মাঝে। এ ঘটনাটি ঘটে তাদের বয়স এবং অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে একটি পরিণত পর্যায়ে এবং এর সঙ্গে অন্যান্য রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাও যুক্ত ছিল। অন্যদিকে ’৫০-এর শিল্পীরা অর্থাৎ আমিনুলরাও নিরীক্ষাধর্মী কাজ শুরু করেন পূর্ব পাকিস্তান পর্যায়ে এবং তখনো এ দেশের অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের নিজেদের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম চলছিল। আমিনুলরা যে বাঙালি সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করেছেন, তা নয়। তার প্রমাণ তাঁরা এ দেশের প্রকৃতি আর সাধারণ মানুষকেই বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তবে তাঁদের আগ্রহ ছিল পাশ্চাত্য চিত্রচর্চার কিছু নিরীক্ষাপ্রবণতার দিকে, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ক্যালকাটা গ্রুপের প্রসঙ্গ আরেকবার উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীরা এই আঙ্গিকের অন্বেষণকে তৎকালীন বাস্তবতা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলানোর কথা বলেছেন (মৃণাল, ২০০৫ : ২৬৩)। ক্যালকাটা গ্রুপের মতো আমিনুলরা এক সাথে আঙ্গিক ভাবনা নিয়ে কোনো সংগঠন গড়ে না তুললেও বা নির্দিষ্ট কোনো মতাদর্শের অধীনে এক না হলেও তাদের প্রত্যেকেই ছবির নতুন আঙ্গিক-ভাবনা নিয়ে কাজ করেছেন এবং এই ভাবনা থেকেই আমাদের আধুনিক চিত্রচর্চা দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয় অবয়বধর্মী এবং নিরাবয়ব বিমূর্ত চিত্ররীতি নিয়ে।

এবার আসা যাক অপ্রতিনিধিত্বশীল বা নিরবয়ব বিমূর্ত রীতির চিত্র আলোচনায়। বিমূর্ত প্রকাশবাদ (Abstract Expressionism) আমাদের দেশের পঞ্চাশের দশকের শিল্পীদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে (আবুল মনসুর, ২০১৬: ১২৭)। এই প্রভাবে আমাদের দেশের শিল্পীরা অপ্রতিনিধিত্বশীল বিমূর্ত চিত্রচর্চা শুরু করেন। যেমন আমিনুল ইসলামের ‘ভুলে যাওয়া সুরের ছন্দ’, হামিদুর রাহমানের ‘আমার প্রিয় রুমাল’, মুর্তজা বশীরের ‘দেয়াল-৪৮’ (তেলরং, ১৯৬৭), কাইয়ুম চৌধুরীর ‘গোধূলি-১’ (মেসোনাইটে তেলরং, ১৯৬৫), আবদুল বাসেতের ‘ঝরাপাতায় শিশিরবিন্দু’ (তেলরং, ষাটের দশক) ও ‘প্রতিবিম্ব’, দেবদাস চক্রবর্তীর ‘কম্পোজিশন’ এবং মোহাম্মদ কিবরিয়ার ১৯৬৩ সালে করা একটি তেলচিত্র, যার শিরোনাম পাওয়া যায়নি প্রভৃতি।

বিমূর্ত প্রকাশবাদী শিল্প আন্দোলন নিউইয়র্কে বিশ শতকের ’৪০-এর দশকে গড়ে ওঠে। ‘৫০ ও ‘৬০-এর দশকে আমাদের দেশের শিল্পীদের বিমূর্ত প্রকাশবাদী রীতির বৈশিষ্ট্যের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার পেছনে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির চেয়ে বেশি প্রভাব ছিল আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিমূর্ত শিল্পকে রাজনীতিকরণের আওতার মধ্যে নিয়ে আসা। এ কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীসময়ে এই আন্দোলনকে কী ভূমিকায় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, সে প্রসঙ্গে স্বল্প পরিসরে হলেও একটু আলোচনা প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই পৃথিবী ঠান্ডা লড়াই বা যুদ্ধের সম্মুখীন হয় রাশিয়ার নেতৃত্বে থাকা সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ এবং আমেরিকার নেতৃত্বে থাকা পুঁজিবাদী পশ্চিমের মধ্যে (B V Rao, 1989: 229)। দুই পরাশক্তির অতিশয় সরাসরি আক্রমণাত্মক বিরোধিতার ক্ষেত্রে

উচ্চতর সামরিক, কূটনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক কৌশলসমূহ আশুকর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় পূর্ণ বিজয়ের জন্য। এ ছাড়া সাম্যবাদ এবং পুঁজিবাদের মধ্যে যে ভাবাদর্শগত দ্বন্দ্ব বা বিরোধ ছিল, তা প্রকাশ পায় আধুনিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে, যেমন — শিল্প, সংগীত ও সাহিত্য (Battaglia, 2008: 1)। ফলে এই যুগের আভা-গার্দ (Avant-garde) আন্দোলন (সবচেয়ে অগ্রগামী, নতুন উদ্ভাবন ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ও ভাবনা), যার দায়ভার ছিল আধুনিক শিল্প, সংগীত ও সাহিত্যসৃষ্টির, সেই আভাঁ-গার্দ আন্দোলনেরও কৌশলগত অত্যাবশ্যকীয় গুরুত্ব ছিল দুই পক্ষের জন্য (অর্থাৎ সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদ), যদিও অনেক সময়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে শিল্পী নিজেই অজ্ঞাত থেকে যেতেন তার শিল্পের এই রাজনীতিকরণ সম্পর্কে (Battaglia, 2008: 1)। এখন প্রশ্ন আসে, বিমূর্ত প্রকাশবাদ শিল্পের কোন বৈশিষ্ট্যগুলো পুঁজিবাদীদের জন্য ঠান্ডা যুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচিত হলো। 'Oxford Dictionary of Art-এ বিমূর্ত প্রকাশবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> The painters embraced by the term shared a similarity of outlook rather than of style-an outlook characterized by a spirit of revolt against affiliations with traditional styles or prescribed technical procedures, renunciation of the ideal of a finished art product subject to traditional aesthetic canons, an aggressive spirit of self-determination, and a strong demand for spontaneous freedom of expression (Chilvers et al. 1988: 2).

বিমূর্ত প্রকাশবাদের বৈশিষ্ট্যকে রাজনীতির আওতায় নিয়ে আসার ব্যাখ্যা নানাভাবে হয়েছে। ম্যানফ্রেড জে হলার (Manfred J Holler) এবং বারবারা ক্লোস-উলমানের (Barbara Klose-Ullmann) বক্তব্য হলো, সিআইএ মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট এবং কংগ্রেস অব কালচারাল ফ্রিডম এই দৃশ্যপটের প্রধান খেলোয়াড় হলে, বিমূর্ত প্রকাশবাদী শিল্পীরা সেই খেলার ঘুঁটি এবং শিল্পসমালোচক ক্লেমেন্ট গ্রিনবার্গ (Clement Greenberg) এবং হ্যারল্ড রজেনবার্গ (Harold Rosenberg) হলেন সেই শিল্পীদের মুখপাত্র। এই দৃশ্যপটে প্রধান ভূমিকা যাঁদের ছিল তাঁরা শিল্পীদের সম্পর্কে ছিলেন উদাসীন এবং তাঁদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ছিল শিল্পীদের কাজ এবং এই কাজের পেছনে ভাবাদর্শের ওপর। পুরো বিষয়টিতে একটা আপাতবিরোধী ভাবনা কাজ করছিল, কারণ ব্যক্তিকতাবাদ ছিল বিমূর্ত প্রকাশবাদের ভিত্তি এবং এই ব্যক্তিকতাবাদের জন্য এই শিল্পকে সমাজতন্ত্রের সমষ্টিগতভাবের শিল্পের বিকল্প হিসেবে দেখা হচ্ছিল (Holler & Ullmann, 2010: 8)।

তিরিশের দশকে অনেক বিমূর্ত প্রকাশবাদী শিল্পীর রাজনৈতিক শিকড় বা ভিত্তি (political roots) ছিল মার্কসবাদে, যদিও চল্লিশের দশকে এতে পরিবর্তন আসে (Holler & Ullmann, 2010: 10)। এর কারণ হিসেবে থমাস বেনডার (Thomas Bendar) বলেছেন, আমেরিকায় বামপন্থীদের জন্য অনেকগুলো বিধ্বংসী রাজনৈতিক মোহভঙ্গ যেমন, ১৯৩৬-৩৮ সালের মস্কো শো ট্রায়ালস (Moscow show trials), ১৯৩৯ সালের হিটলার-স্টালিন প্যাক্ট (Hitler Stalin Pact) এবং ১৯৪৫ সালের আণবিক বোমা প্রভৃতি বিষয় শিল্পীদের জন্য অরাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। এই শিল্পীরা যদিও '৩০-এর দশকে সমাজের সংকট ও আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তনের স্বপ্নের দ্বারা সামাজিক

দায়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন, তথাপি তাঁরা নিজেদের এই রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং অপ্রতিনিধিত্বশীল শিল্পভাষার সম্ভাবনাকে অন্বেষণ করেছিলেন। এই অন্বেষণকে সহজ করেছিল মেয়ার শ্যাপিরোর (Meyer Schapiro) ১৯৩৭ সালে Marxist Quarterly-তে প্রকাশিত 'The Nature of Abstract Art' প্রবন্ধটি, যেখানে বিমূর্ত শিল্পে মানবতা এবং এর সাথে সামাজিক অভিজ্ঞতার যোগাযোগের কথা বলা হয়েছে (Bendar, 1984)। শ্যাপিরো তাঁর সেই প্রবন্ধে লিখেছেন, বিষয়ের সব বর্ণনাই, হোক তা অবিকল, এমনকি ফটোগ্রাফও মূল্যবোধ, কৌশল এবং দৃষ্টিকোণ থেকে নির্গত হয়, যা ভাবমূর্তিকে (Image) আকার প্রদান করে এবং বিষয়বস্তুকে নির্ধারণ করে। অন্যপক্ষে অভিজ্ঞতার দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত বা শর্তহীন 'শুদ্ধ শিল্প' বলে কিছু নেই। সকল কল্পনা এবং আকারগত গঠন, এলোমেলো বা হিজিবিজি রেখাঙ্কনকেও আকার দেয় অভিজ্ঞতা এবং অনন্দনতাত্ত্বিক সম্পৃক্ততা (Schapiro, 1979: 196)। তিনি আরো লেখেন, তাৎক্ষণিকভাবে রচিত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আকারের বিকৃতি বা প্রচ্ছন্ন করে বিমূর্ত রীতির চর্চার মধ্য দিয়ে শিল্পী তার অবদমিত অন্তর্জগতের ইঙ্গিতময় বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। তবে শিল্পীর কল্পনা নির্মাণের কৌশল শিশু কিংবা মানসিক রোগীর থেকে ভিন্ন, কারণ শিল্পীর প্রধান পেশা হলো মানবীয় মূল্যবোধের সচেতন উৎস থেকে উদ্ভাবন করা। এরই সূত্র ধরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতি মনোভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঊনবিংশ শতাব্দী, এর বাস্তবধর্মী চিত্র, যুক্তিবাদ এবং উদ্ভাবন, বস্তুতন্ত্র ও কৌশলের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অলংকরণকে গ্রাহ্য করেছে, কিন্তু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উপস্থাপনকে বিকট বা বীভৎস হিসেবে বিবেচনা করেছে। অন্যপক্ষে বিমূর্ত শিল্পীরা আপেক্ষিকভাবে উদাসীন ছিল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জ্যামিতিক মোটিফের প্রতি। কিন্তু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিল্পের বিকৃত, উদ্ভট, কল্পনাপ্রসূত অবয়বের সাথে আধুনিক একদল শিল্পীরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছে (Schapiro, 1979: 199-200)। এ ছাড়া অনেক বিমূর্ত প্রকাশবাদী শিল্পী ছিল কার্ল ইয়ুংয়ের (Carl Jung) অনুসারী। ইয়ুংয়ের মতবাদ বিমূর্ত প্রকাশবাদী শিল্পীদের প্রভাবিত করেছে এবং রাজনীতিকরণে ব্যবহৃত হয়েছে তবে এই প্রভাব এবং রাজনীতিকরণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ম্যানফ্রেড জে হলার এবং বারবারা ক্লোস-উলমান লিখেছেন, ইয়ুংয়ের অনুসারী শিল্পীরা বিশ্বাস করত যৌথ অবচেতন হলো বিশ্বজনীন এবং সমগ্র মানবজাতিতে অভিন্ন এবং শিল্পের কাজ হলো স্থানীয় নয় বরং বিশ্বজনীনতায় রূপান্তরিত করার জন্য সেই গূঢ়লেখকে আবিষ্কার করা। অবচেতনে গিয়ে শিল্পীরা অভিজ্ঞতার গভীর থেকে রূপক, প্রতীক বের করে আনেন, যা বিশ্বজনীনতা ধারণ করে। এটাই ছিল বিশ্বজনীনতার আধ্যাত্মিক-বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি এবং যুদ্ধ-পূর্বকালীন আমেরিকার বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবের মুক্তি — যা ছিল শিল্পকে সাংস্কৃতিক যুদ্ধে ব্যবহার করার পূর্বশর্ত (Holler & Ullmann, 2010: 10)। ১৯৫৬ সালের মধ্যে MoMa-র আন্তর্জাতিক কর্মসূচি ৩৩টি প্রদর্শনীর আয়োজন করে, যার মধ্যে ভেনিস বিয়েনালে অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত ছিল (Holler & Ullmann, 2010: 7)। MoMa-র আন্তর্জাতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যে বিষয়টি ঘটে, তাকে ইভা কক্রফ্ট (Eva Cockroft) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, শিল্পের জগতে বিমূর্ত প্রকাশবাদ এই প্রচারমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য আদর্শ রীতি গঠন করেছিল। বিমূর্ত প্রকাশবাদ ছিল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বৈশিষ্ট্য যেমন নিয়ন্ত্রিত, ঐতিহ্যগত এবং সংকীর্ণতার নিখুঁত বিপরীত। এটা ছিল নতুন, সতেজ এবং সৃষ্টিশীল, শৈল্পিক দিক দিয়ে

আভাঁ-গার্দ এবং আমেরিকাকে প্যারিসের সাথে প্রতিযোগিতায় হালনাগাদ হিসেবে দেখাতে পেরেছিল (Cockroft, 2000: 150-51)।

বিমূর্ত প্রকাশবাদ শিল্প আন্দোলন নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে রাজনীতিকরণের বিষয়ে একটু বিস্তৃত পরিসরে এখানে আলোচনা করা হলো এ কারণে যে, এই রাজনীতিকরণের কারণে এই শিল্পরীতি বা শিল্প আন্দোলন বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করে এবং এই রীতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পায়। এই রীতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, যেমন 'মুক্ত প্রকাশ' (free expression), 'বিশ্বজনীনতা' (universalism), 'স্বাতন্ত্র্যবাদ' (individualism) প্রভৃতি শিল্পীকে আকৃষ্ট করে। '৫০ ও '৬০-এর দশকে আমাদের শিল্পীরাও এই প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেননি। এ ক্ষেত্রে এটা বলা অমূলক হবে না যে আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির চেয়ে বিশ্বব্যাপী বিমূর্ত প্রকাশবাদের আধিপত্য আমাদের শিল্পীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল এই রীতিকে তাদের চিত্রচর্চার সাথে অঙ্গীভূত করে নিতে। আমাদের শিল্পীরা বিমূর্ত প্রকাশবাদ শিল্পরীতির আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার পেছনে যে রাজনীতি ক্রিয়াশীল ছিল সে সম্পর্কে সচেতনতা থেকে এই রীতি গ্রহণ করেননি। তাঁরা আন্তর্জাতিক আধুনিক শিল্পভাষা হিসেবে নিজেদের দেশের চিত্রচর্চায় অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন এই রীতিকে। পিকাসো এবং অন্য আধুনিক শিল্পীরা যেমন 'আদিম' শিল্পের বৈশিষ্ট্যকে এর সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতকে বাদ দিয়ে তাদের শিল্পে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন সেরকম। কলিন রোডসের (Colin Rhodes) বক্তব্য থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। তিনি লিখেছেন, শিল্পীরা যখন আদিম শিল্পকে ব্যবহার করেন তখন তারা একটি সমালোচনামূলক অবস্থান গ্রহণ করেন, তবে তা আদিম শিল্পকে কেন্দ্র করে না, বরং তাদের নিজেদের সমাজের সভ্য নিয়মকে উদ্দেশ্য করে । এটা তারা করেছিল হয় সমাজ পরিবর্তনের জন্য অথবা পশ্চিমের প্রতিষ্ঠিত শিল্পচর্চাকে সমালোচনা করার জন্য (Rhodes, 1994: 110)। কলিনের আরো কিছু বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। যেমন তিনি লিখেছেন, পিকাসোর ডেমওয়াজেল (Demoisselles) চিত্রকর্মের নারীরা ঔপনিবেশিক আদিমের' 'অন্য'-এর প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি, এই 'অন্য' পশ্চিমা সংস্কৃতির নিজস্ব, যে সংস্কৃতির ভিত্তি ভয়ংকর যৌনতা (Rhodes, 1994: 91) এবং কলিনের আরো একটি বিশ্লেষণ হলো, কির্চনারের (Kirchner) আদিমতাকে ভৌগোলিক অথবা ঐতিহাসিক সুদূর আদিমের সাথে ভাববিনিময় হিসেবে দেখা উচিত হবে না। এটা তাঁর বোহেমিয়ান জীবনের অংশ এবং এর মাধ্যমে ইউরোপের বাইরের অঞ্চলের শিল্পভাষা নিয়ে এমন একটি ভাবমূর্তি (image) তৈরি করেছে, যা নিজেই প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মের থেকে ভিন্ন (103)। অর্থাৎ 'আদিম' শিল্পকে ইউরোপের শিল্পীরা তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত শিল্পকে সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। বিমূর্ত প্রকাশবাদকেও আমাদের দেশের শিল্পীরা নিজেদের প্রেক্ষাপটে এভাবেই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা এর সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি নয় বরং শৈল্পিক গুণাবলিকে নিজেদের সংস্কৃতিতে অভিযোজন করেছেন এবং এর মাধ্যমে আমাদের চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে নতুন ভাষা সংযোজন করেছেন।

বিষয়টিকে আর একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অর্থাৎ '৫০-এর দশকের শেষ পর্ব থেকে '৬০-এর দশক পর্যন্ত এখানে বিমূর্ত চিত্রভাষাচর্চার স্বরূপ কেমন ছিল? ১৯৬১ সালের

Contemporary Art in Pakistan নামক জার্নালে বি কে জাহাঙ্গীর (BK Jahangir) আমিনুল ইসলামের বিমূর্ত চিত্রকর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন:

> Though Aminul Islam's researches in the field of form are intensive, he does not fall into formalism. He is bound up with reality. He delights in interwoven [sic] of form and sense emerging from a fleeting study of phenomena of nature or of daily life. From a given situation he proceeds, sometimes like a musician, using memory towards building up a harmonious relationship. ...Sometimes, nature becomes a starting point, and from there he develops. an internal image of a fleeting phenomenon, thus blending the entire range. of formal and creative possibilities. *In before the Flight,* the colour seems to leap out from the gay whirl of the paint, the horizontal strokes refer to the rising rhythm of the butterfly, vibrating in high notes ...
>
> Aminul Islam's sense of exploration sometimes makes him a pretender of actual experience (B K Jahangir, 1961: 10).

মাহমুদ আল জামান '৬০-এর দশকে আবদুল বাসেতের বিমূর্ত চিত্রকলার ব্যাখ্যায় লিখেছেন:

> এই পর্বে বাসেত বিশেষত ১৯৬৪ সালে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত বিষয় ছন্দোময় হয়ে উঠলেও তিনি সময়ের উত্তাপকে অস্বীকার করতে পারেননি। তৎকালে দেশে বিরাজমান স্বৈরশাসন, নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ষাটের দশকের মধ্য পর্যায় থেকে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহে পালাবদলের হাওয়া লেগেছিল। সচেতন বাসেতের হৃদয়মনে তা প্রচ্ছন্ন দাগ কেটেছিল।
>
> ... তাঁর সামাজিক অঙ্গীকারের চেতনা ছিল ছবিকে ঘিরে। তাঁর সৃষ্টিতেই তিনি সমাজের তমসাকে ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই সময়ের কম্পোজিশন-সিরিজের চিত্রগুচ্ছে তিনি ধূসর রং-ব্যবহারের মাধ্যমে সময়কে বিম্বিত করেছেন। এই ধূসরতা নব অর্থযোজনা করেছিল তাঁর এই চিত্রগুচ্ছে। ... বাসেত বিমূর্ত ধারাকে আশ্রয় করে এই ধূসর সময়কে অঙ্কনে প্রয়াসী হলেন। (মাহমুদ, ২০০৪: ৩০)

ওসমান জামাল আমিনুলের 'Transformation' চিত্রমালার ব্যাখ্যায় লিখেছেন, '১৯৬৭ সালের Transformation সিরিজের অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিস্ট ছবিগুলোর একটা ব্যাখ্যা দিয়ে আমিনুল বলেছেন যে ছবিগুলো তার মনোজাগতিক পরিবর্তনের বিমূর্তায়িত চিত্র, যে রাজনীতিক অস্থিরতা ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পর্যবসিত হয়েছে এরা তার প্রতিফলন এবং সেই বিপর্যয়ের ভবিষ্যৎ নির্দেশকও বটে' (ওসমান, ২০০৪: ৩২)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ভাষা অভিযোজনের ক্ষেত্রে দ্বিধা উপস্থিত হয়েছে। যেমন মুর্তজা বশীরের কথা বলা যায়। তিনি স্মৃতিচারণায় লিখেছেন:

> ১৯৬৬ সালের ঘটনা এসব, আমার সমসাময়িক শিল্পী বন্ধু আমিনুল ইসলাম, কিবরিয়া সবাই তখন অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি আঁকছে। আমি তখনো ফিগারেটিভ করি। কারণ সমাজের

> প্রতি দায়বদ্ধতা... একদিকে আমার বিশ্বাস, অন্যদিকে বিমূর্ত ছবি আঁকছি না বলে একধরনের হীনম্মন্যতা ও বন্ধুদের কাছে অনাধুনিক হিসেবে গণ্য হচ্ছি। সব মিলিয়ে বেশ টানাপড়েনের মাঝে ছিলাম। তখন বেগমবাজারে থাকতাম। রিকশায় জেলখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছি একদিন। হঠাৎ জেলখানার দেয়ালে নজর গেল। পলেস্তারা খসে ইট উঁকি দিচ্ছে, কোথাও আলকাতরা দিয়ে হাতের ছাপ, আবার পোস্টার লাগিয়ে ছিঁড়ে ফেলার কিছু অংশ বা আঠারো দাগ রয়েছে। তখন ভাবলাম কেন আমি এইসব আঁকি না। তখনই দেয়াল সিরিজের চিন্তা আসে। (মুর্তজা, ২০১৪: ৪৩)

মুর্তজা বশীরের দেয়াল সিরিজের অনেক ছবিই পুরোপুরি বিমূর্ত। যেমন, 'দেয়াল-৫৮' ক্যানভাসে তেলরং, ১৯৬৯)।

এভাবে আমাদের শিল্পীরা বিমূর্ত রীতিকে নিজেদের চেতনার সাথে অভিযোজন করেছেন। ওপরের আলোচনাগুলো থেকে বোঝা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পীর চেতনাজুড়ে ছিল তাঁর পারিপার্শ্বিক, প্রকৃতি, সমাজ, দেশ। মুর্তজা বশীরের বক্তব্য সে সময়ের বিমূর্ত ভাষার আধিপত্যবাদী ভূমিকাকেও প্রকাশ করে। তবে বিমূর্ত রীতির চর্চা করলেও দেশজ চেতনাকে শিল্পীরা বাদ দিতে পারেননি। একটি ছবি উদাহরণ হিসেবে আলোচনা করা যেতে পারে। তা হলো কাইয়ুম চৌধুরীর 'নৌকা' (মেসোনাইটে তেলরং, ১৯৬৭)। ছবিটি বিমূর্ত, এখানে কোনো মূর্ত রূপ নেই, কিন্তু তুলির আঁচড়ে লোকশিল্পের আলংকারিক গুণের ইঙ্গিত আছে, হলুদ ও নীল রঙের ব্যবহার লোকশিল্পে ব্যবহৃত রঙের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং একই সঙ্গে গ্রামীণ প্রাকৃতিক পরিবেশেরও ইঙ্গিত দেয়। রঙের মাধ্যমে মূলত রূপগুলো তৈরি, তবে তা সুস্পষ্ট কোনো রূপকে প্রকাশ করে না। কিন্তু ছবিটি দেখলে গাছপালা, নদী, নৌকার রূপ মানসপটে ভেসে ওঠে। বিমূর্তভাবে আঁকা সত্ত্বেও দক্ষতার সাথে শিল্পী আমাদের গ্রামীণ পরিবেশীয় সংস্কৃতিকে এই চিত্রে মূর্ত করেছেন এবং প্রকাশের ধরনে মৌলিকত্ব আছে। দেশীয় বিষয়, ভাবনা এবং বিদেশি প্রকাশরীতি — এই দুইয়ের সম্মিলনে একটি ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, যা আমাদের নিজস্ব। যাকে পার্থ মিত্রের ভাষায় বলা যায়, 'They found sustenance in a form of syncretism that offered fresh existential and epistemological possibilities (Partha, 2008: 538)। অর্থাৎ আমাদের অঞ্চলে বিমূর্ত রীতির পরিপুষ্টি ঘটেছে এ অঞ্চলের সংস্কৃতি আর অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে, যা চিত্রভাষা নির্মাণে নতুন জ্ঞানের উন্মোচন ঘটিয়েছে। এভাবেই আমাদের চিত্রচর্চা বিমূর্ত চিত্রভাষা নিয়ে দ্বিতীয় ধাপে উন্নীত হয়েছে। তবে এর পরও কথা থেকে যায়। কারণ, চিত্রভাষা নির্মাণের নতুন জ্ঞান যে দ্বিতীয় পর্যায়ে বা আমিনুলদের সময়ে এসে সৃষ্টি হয়েছে তা কিন্তু নয়। এই নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি আমরা পেয়েছি জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান ও সফিউদ্দীন আহমদের '৫০-এর দশকের চিত্রকর্মের মধ্য দিয়ে। ১৯৫১ সালে করা জয়নুলের 'মা ও শিশু', 'কলসি কাঁখে নারী', ১৯৫৩ সালের 'বাঙালি রমণী', 'কৃষক', কামরুল হাসানের ১৯৫০ সালে আঁকা 'মাছ ধরা', ১৯৫৫ সালের 'তিন কন্যা' কিংবা সফিউদ্দীনের ছাপচিত্র মাধ্যমে করা 'জেলের স্বপ্ন', 'হলুদ জাল', এবং '৬০-এর দশকের 'মাছ ধরার সময়-১', 'বিক্ষুব্ধ মাছ', 'জাল ও মাছ-২' প্রভৃতি ছবির ভাষা এ বক্তব্যকে প্রমাণ করে। কাজেই এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে বাংলাদেশের '৪০

ও ’৫০ দশকের শিল্পীদের ’৫০ ও ’৬০ এর দশকে করা নিরীক্ষামূলক চিত্রকর্ম আমাদের আধুনিক চিত্রকলা চর্চার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ ’৫০-এর দশকের প্রথম দিকে আত্মপরিচয় নির্মাণের মাধ্যমে আমাদের আধুনিকতা নির্মাণের প্রক্রিয়ায় চিত্রভাষার এই নতুন জ্ঞান নির্মাণের যাত্রা শুরু হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ’৫০ ও ’৬০-এর দশকেও তা অব্যাহত থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জয়নুলদের আত্মপরিচয় নির্মাণের ভাষা, যাকে প্রথম পর্যায় হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে এবং আমিনুলদের বিমূর্ত রীতির ভাষা যাকে দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে — দুটো পর্যায়ের ভাষাই আধুনিক নিরীক্ষামূলক ছবি চর্চার ভাষা, যা পাশ্চাত্য চিত্রচর্চার সংস্পর্শে এসে বিকশিত হয়েছে এবং আমাদের আধুনিক চিত্রের ভাষা হয়েছে। জয়নুলদের ক্ষেত্রে চিত্রভাষা নির্মাণে উপনিবেশবাদবিরোধী ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল বেশি। তাঁরা কিউবিজম, এক্সপ্রেশনিজম, ফবিজমের রীতির সাথে লোকশিল্পের আঙ্গিকের সংশ্লেষ ঘটিয়েছেন, যেখানে লোকরীতি প্রাধান্য বিস্তার করেছে। যেমন গুণটানা’, ‘দুই বোন’, ‘গল্পগুজব’, ‘Vision’ ইত্যাদি। মানুষের অবয়ব নির্মাণে লোকপুতুলের আদল,বহির্রেখার ব্যবহার, অনেক ক্ষেত্রে লোকচিত্রের মতো পশ্চাৎপট ফাঁকা রাখা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রয়োগ হয়েছে চিত্রে। সফিউদ্দীন হেইটারের ছবির স্পেস বিভাজনকে সুনিপুণভাবে বাংলার নদীর বাঁক, ঢেউ, মাছ ইত্যাদির সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন। সুলতানের ’৫০-এর দশকের কাজে গ্রামীণ প্রকৃতি ও মানুষ অঙ্কনে একাডেমিক রীতি উপেক্ষিত হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। বাস্তব বিষয়ের চিত্রণ হলেও আলোছায়ার ব্যবহারে ভলিউম তৈরির কোনো প্রচেষ্টা নেই। আমিনুলরা কৌশলের দিক দিয়ে পরিবর্তন আনলেও মুখ্য পরিবর্তন এনেছেন চিত্রভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে। জয়নুলের শিল্পদর্শনের প্রভাব পড়েছিল আমিনুলদের ওপর ঢাকায় শিল্পশিক্ষা লাভের সময়। এই প্রভাবে মানুষের জীবন বিশেষত সাধারণ মানুষের জীবন এবং দেশের প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের শিল্পচেতনা গড়ে ওঠে। শিল্পশিক্ষা শেষ করার অব্যবহিত পর তারা নিরীক্ষামূলক ছবি নির্মাণ করেন। এই পর্যায়ে পাশ্চত্যের শিল্পচর্চার ইতিহাসে পোস্ট-ইম্প্রেশনজিনম, কিউবিজম ও ফবিজমের শিল্পীদের ক্যানভাসের দুই মাত্রার স্পেস বা সমতল বৈশিষ্ট্য এবং তিন মাত্রার ভ্রম তৈরি এ দুইয়ের মাঝে যে বোঝাপড়া নির্ণয়, যাকে আরনাসন বলেছেন শিল্পের নতুন বাস্তবতা বা ধারণামূলক বাস্তবতা এবং এর ফলে যে বিমূর্ত ভাষা তৈরি হলো, সেই ভাষাকে আমিনুলরা গ্রহণ করলেন তাঁদের পরিপ্রেক্ষিতে ছবি তৈরির ক্ষেত্রে। এবং এই বিমূর্তের নানা তারতম্য ঘটিয়ে এ দেশের বিষয়াবলি নিয়ে নতুন ছবি নির্মাণ করলেন। তাঁদের ছবির সমতলভাব নির্মাণে পাশ্চাত্যের নিরীক্ষার প্রভাব বেশি। যদিও পাশ্চাত্যের প্রেক্ষাপট এখানে মুখ্য নয়। আমিনুলদের নিজেদের পরিবেশে, সংস্কৃতিতে এই ভাষা কীভাবে অভিযোজিত হলো, সেটাই মুখ্য। এই পর্যায়ের বিমূর্ত ছবিগুলো কিছুটা প্রতিনিধিত্বশীল। এরপর বিমূর্ত প্রকাশবাদের প্রভাবে তাঁরা অপ্রতিনিধিত্বশীল বিমূর্ত রীতির প্রতি মনোযোগী হন। বিমূর্ত প্রকাশবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আভাঁ-গার্দ আন্দোলন হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধে আমেরিকার জন্য সাংস্কৃতিক হাতিয়ার হয়ে ওঠে। এই রীতির ব্যাপক প্রসার, প্রচার এবং এর বিশ্বজনীনতা আমিনুলদের প্রভাবিত করে। তাঁদের কাছে এই রীতি আধুনিকতার

সমার্থক হয়ে ওঠে। তাঁরা এই ভাষা আগ্রহের সাথে আয়ত্ত করেন। তবে এ ক্ষেত্রে তাঁদের চেতনায় ক্রিয়াশীল ছিল নিজেদের দেশের অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতি, পরিবেশ। তাঁরা একেবারে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে এই ভাষার চর্চা করেননি। সমাজ এবং দেশের প্রকৃতি তাঁদের ভাবনার উৎস ছিল। কাজেই শিল্পীদের চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে নিজেদের পরিপ্রেক্ষিত একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচিত ছিল। এটা যেমন জয়নুলদের ক্ষেত্রে, তেমনি আমিনুলদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে সময়ে, যে প্রেক্ষাপটে চিত্র নির্মিত হয়, চিত্রের ভাষার বৈশিষ্ট্যকে অনেকটা তা নির্ধারণ করে। এর সাথে শিল্পীর ভাবনা বা শিল্পীমানস এবং প্রভাবক হিসেবে চিত্রভাষার নির্বাচনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি দেশের সামগ্রিক ইতিহাসকে উপেক্ষা করে কিংবা বৈশ্বিক ইতিহাসের গতিধারাকে উপেক্ষা করে হয়তো শিল্পচর্চা সম্ভব হয় না। এ বিষয়গুলো এই প্রবন্ধের চিত্রভাষা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতে সহায়ক হয়েছে। এই বিমূর্ত চিত্রভাষা পরবর্তীসময়ে বাংলাদেশের চিত্রভাষার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

আবুল মনসুর, ২০১৬। *শিল্পকথা, শিল্পী কথা,* বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা ।

আমিনুল ইসলাম, ২০০৩। *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর প্রথম পর্ব ১৯৪৭-১৯৫৬,* বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

ওসমান জামাল, ২০০৪। *আমিনুল ইসলাম,* শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

নজরুল ইসলাম, ২০১২। ষাটের দশকের শিল্প ও শিল্পী: বিমূর্ত আঙ্গিকের প্রাধান্য', *শিল্প ও শিল্পী,* প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৮, ফেব্রুয়ারি ২০১২, ঢাকা।

নিসার হোসেন, ২০০৭। 'জয়নুল আবেদিন', *চারু ও কারু কলা, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮* সম্পাদক: লালা রুখ সেলিম], বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

পরিতোষ সেন, ২০০২। *কিছু শিল্পকথা,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা।

মৃণাল ঘোষ, ২০০৫। *বিংশ শতাব্দীর ভারতের চিত্রকলা আধুনিকতার বিবর্তন,* প্রতিক্ষণ, কলকাতা।

মাহমুদ আল জামান, ২০০৪। *কাজী আবদুল বাসেত,* বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা ।

মুর্তজা বশীর, ২০১৪। *আমার জীবন ও অন্যান্য,* বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক, ২০১৫। জয়নুল *আবেদিন সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র,* প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক, ২০১৫ক। *কাইয়ুম চৌধুরী শিল্পীর একান্ত জীবনকথা,* প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

Arnason, H H. 1977. *A History of Modern* Art, Thames and Hadson, London.

Bender, Thomas. 1984. Behind the Scene of Abstract Expressionism'*, The* New *York* Times, Archives, https//www.nytimes.com.

Battaglia, Louis. 2008. 'Clement Greenberg: A Political Reconsideration', *Shift. Queen's Journal of Visual and* Material *Culture*, Issue 1 shiftjournal.org.

B K Jahangir. 1961. Aminul Islam', *Contemporary Arts in Pakistan*, Ed. Jalal Uddin Ahmed, Autumn, Vol-11, No.3.

BV Rao. 1989. *History of Modern Europe 1789-1975*, Sterling Publishers Private Limited, New Delhi.

Chilvers, lan. Osborne, Harold &Farr, Dennis. (Edited). 1988. *The Oxford Dictionary of* Art, Oxford University Press, New York.

Cockcroft, Eva. 2000. Abstract Expressionism Weapon of the cold War', *Pollock and after The Critical Debate.* Ed. Francis Frascina, Routledge, London &New York.

Golding, John 1997. Cubism, *Concepts of Modern Art From Fauvism to Postmodernism*, Thames and Hudson, London.

Holler, Manfreed J. Klose-Ullamann, Barbara. 2010. 'Abstract Expressionism as a weapon of Cold War, *https:* www.researchgate.net>publication.

Livasgani, Raimond. 2004. *Artists and Prints: Masterworks from the Museum of Modern Art*, Deborah Wye. The Museum of Modern Art, New York, moma.org.

Lala Rukh Selim, 1998. '50 Years of the fine Art Institute' *ART*. Vol. 4. No. 2, October-December, Dhaka.

Partha Mitter. 2007. *The Triumph of Modernism India's Artists and the Avant-Garde 1922-1947*, Reakton Books, London.

Partha Mitter, 2008. Decentering Modernism: Art History and Avant-Garde Art from the Periphery, *The Art Bulletin*, Vol. 90. No.4 December, pp. 531-548, College. art Association, http://www.jstor.org

Partha Mitter. 2014. 'Modern Global Art and Its Discontents", *Avant-Garde Critical Studies.* Vol-30.p.35.https://www.societyforasianarh.org.

Rhodes, Colin. 1994. Primitivism *And Modern Art*, Thames and Hudson, New York.

S. Amjad Ali. 1959. National Art Exhibition', *Pakistan Quarterly*, Vol. viii, No.4. Spring.

Schapiro, Meyer. 1979. Nature of Abstract Art (1937)', *Modern* Art 19 and 20 Centuries *selected Papers,* George Braziller, New York.